

রবীন্দ্র প্রবন্ধে নারী

বন্যা আহমেদ

সেপ্টেম্বর ২৫, ২০০৫

একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে যে, তিনি যতখানি প্রভাবিত ছিলেন ভিকটোরিয়ান সামন্ততান্ত্রিকতা দিয়ে তার চেয়ে আসলে অনেক বেশি প্রভাবিত ছিলেন সনাতন হিন্দু ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে এবং উপনিষদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে। গীতা বলছে, তোমার জন্ম পূর্ব-নির্ধারিত, তুমি যে জাতে জন্মাবে সে জাতের কাজ করাই হচ্ছে তোমার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের মুখে কি আমরা নারী সম্পর্কে প্রায় একই কথা শুনছি না? প্রকৃতিই তোমাকে তৈরি করেছে দুর্বল করে, দাসী করে, এর বাইরে তুমি বেরুবে কি করে, এটাই তোমার ভাগ্য, এটাই তোমার ধর্ম, এই দাসত্বকে খুশি মনে মেনে নেওয়াতেই তোমার মংগল। ... কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই নারীবিরোধী অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পাই তার শেষ বয়সে লেখা নারী প্রবন্ধে। হুমায়ূন আজাদ সে সম্পর্কে সঠিকভাবেই বলেছেন, ‘প্রবন্ধটিতে পাই দুই রবীন্দ্রনাথকেঃ এক রবীন্দ্রনাথ পিতৃতান্ত্রিক, যিনি নারীকে মনে করেন প্রকৃতির অভিপ্ৰায় বাস্তবায়নের মাংসল যন্ত্র, যার কাজ সন্তান ধারণ পালন, যে বইছে ‘আদি প্রনায়ের সহজ প্রবর্তনা’ নিজের স্নাতকের মধ্যে; আরেক রবীন্দ্রনাথ, অনেকটা বাধ্য হয়ে মেনে নেন যে নারীকে বেড়িয়ে আসতে হবে বাইরে।... ...

নারী শিক্ষা, নারীবাদ আর নারী স্বাধীনতা - মনে হচ্ছে অনেকেই গুলিয়ে ফেলছেন এই তিনটি শব্দের মধ্যে, কেউ বলছেন রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছেন তাই তিনি নারীবাদী, কেউ বলছেন রবীন্দ্রনাথ বিশাল নারীবাদী লেখক ছিলেন, কেউ বলছেন তার লেখায় নাকি নারী স্বাধীনতার মশাল জ্বলিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেউবা তার মানবতাবাদকে নারীবাদ বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই তিনটি শব্দ ছাড়াও আরেকটি শব্দের অর্থ নিয়েও মনে হয় একটু সমস্যা আছে সবার, আসলে ‘প্রগতিশীল’ কথাটার মানে কি? সময়ের লিটমাস টেস্টে কে আসলে প্রগতিশীল, কে নয়, কে সেটা নির্ধারণ করে দিবে? রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন উঠলেই সবাই বলে ওঠেন তাকে তার সময়ের গন্ডীর বিচার করতে হবে, এটা তো খুবই খাঁটি কথা! আমার তো মনে হয় না এই কথাটি ভুলে গিয়ে কারও লেখা নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা বা আলোচনা করা সম্ভব। আমি নিশ্চয়ই আজকে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নারীর গর্ভপাতের অধিকার কিংবা সমকামী নারীর অধিকার (লেসবিয়ান বা অ্যাবোরশান রাইটস) নিয়ে নারীবাদী কোন আলোচনা আশা করব না! নারীবাদ একটি তত্ত্ব বা মতবাদ, সেটাকে একেকজন একেক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন, আর নারী মুক্তি হচ্ছে তারই একটি অংশ, যাকে অবশ্য অনেক সময়ই নারীবাদের লক্ষ্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু নারী শিক্ষার সাথে নারীমুক্তির একটি পরোক্ষ সম্পর্ক থাকলেও এটি কোনমতেই নারীমুক্তির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেউ নারী শিক্ষার প্রবর্তক হলেই নারীবাদী বা নারী মুক্তির পক্ষের শক্তি হয়ে যাবেন এমন কোন কথা নেই।

এখন আসা যাক আসল রবীন্দ্রনাথ এবং নারী প্রসঙ্গে। একটি ছোটো ঘটনা বলি, আশির দশকের মাঝামাঝি, আমার তখন ১৪-১৫ বছর বয়স, ঢাকার মহিলা সমিতি মঞ্চে নাটক দেখাটা তখন এক ধরনের ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে, মা’র সাথে রবীন্দ্রনাথের শান্তি ছোটগল্পের নাট্যরূপ দেখতে গিয়েছি। শেষ দৃশ্যটা এখনও মনে আছে, ফাঁসির দড়ি বুলছে জেলের করাদের ভিতরের বৌটির মাথার উপর, তার স্বামী

দাড়িয়ে আছে তার সামনে যে তাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে তার বৌদির হত্যার মিথ্যা দায়ে। আসলে হত্যাটি করেছিলো স্বামীটির ভাই, মিথ্যা দায় দিয়ে জেলে পাঠানো হলো বউটিকে কারণ *বউ গেলে বউ পাওয়া যাবে, ভাই গেলে তো আর ভাই ফিরে আসবে না।* থমকে গেলাম পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নির্দোষ অসহায় নারীর আত্মবলিদান দেখে। মাকে জিজ্ঞেস করলাম এটার মানে কি, আমার মা উত্তর দিলেন, তখনকার সমাজে এভাবেই মেয়েদেরকে দেখা হতো, তারপর কিছুক্ষন চুপ করে থেকে আবার বললেন, এখনো যে আমাদের সমাজে তার খুব পরিবর্তন হয়েছে তা কিন্তু নয়! তারপর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে অকারণে রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখাই পড়েছি, যতই পড়েছি, যতই নারী সম্পর্কে তার মতামতগুলো ঝালাই করে নিয়েছি; ততই পরিষ্কারভাবে বুঝেছি তার কাছে নারীমুক্তির সঙ্গায়িত রূপটি আসলে কি ছিলো।

একজন ঔপন্যাসিক বা সাহিত্যিক তার নাটক বা উপন্যাসে অনেক চরিত্র তৈরি করেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তার সৃষ্টিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য। তাই একজন সাহিত্যিককে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথকে, শুধুমাত্র তার নাটক বা উপন্যাস দিয়ে বিচার করা উচিত নয়, বিশেষত যখন তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার মতামতগুলোকে খুব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। ঠিক বুঝতে পারি না, কিছু লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলোকে ‘লঘু’ বা তাড়াহুড়ো করে লেখা প্রবন্ধ বলে আলোচনার থেকে বাইরে রাখতে চান কেনো। একটি, দুটি প্রবন্ধ তো নয়, তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, এগুলোকে ‘লঘু’ বা ‘ফালতু’ বলে উড়িয়ে দেওয়ার অবকাশ কোথায়? আমার তো মনে হয়েছে শত শত পৃষ্ঠা জুড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা তার এই অনবদ্য সৃষ্টিগুলো তার একান্ত মনের কথা। এগুলো থেকেই তার চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, ভাবনাগুলোকে পরিষ্কারভাবে বোঝা সম্ভব। সে যাই হোক, এখানে আমি শুধু প্রবন্ধগুলোতে রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক আলোচনাগুলোকে তুলে ধরবো - শুধুমাত্র সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক চিন্তা ধারাকে বিশ্লেষণ করতে হবে সে সময়ের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা, আন্তর্জাতিকভাবে সারা বিশ্বে তখন কি ঘটছে, নারী আন্দোলনের তদানীন্তন অবস্থা, সমসাময়িক বিভিন্ন শ্রেণীর নারীরা, বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকেরা সে সম্পর্কে কিভাবে ভাবছেন, এই সব কিছুই আলোকে। দেখা যাক তাহলে রবীন্দ্রনাথ নারী সম্পর্কে, নারী মুক্তি সম্পর্কে কি লিখেছেন তার প্রবন্ধগুলোতে।

মহারাষ্ট্রীয় নারীবাদী রমা বাই নারীমুক্তি নিয়ে বক্তৃতা দিতে মঞ্চে উঠলে তাকে আধাপথে থামিয়ে দেন ‘পৌরুষদীপ্ত’ শ্রোতৃগণ। পরবর্তীতে রমা বাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেন,

‘কাল বিক্রমে বিখ্যাত বিদূষী রমা বাই এর বক্তৃতার কথা ছিল, তাই শুনতে গিয়েছিলাম। ... তিনি বন্দন, মেয়েরা অক্ষয় বিষয়ে পুরুষদের অক্ষয়, কেবল মদ্যপানে নয়। তোমার কি মনে হয়। মেয়েরা অক্ষয় বিষয়ে যদি পুরুষের অক্ষয়, তা হলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিশ্চয় অবিচার বন্দে হয়।’

যেখানে বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে জন্মেও ১৮৭১ সালে বলতে পেরেছিলেন যে, ‘স্ত্রী জাতি - সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন - প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন’। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর এই অবস্থার জন্য দায়ী করেছেন প্রকৃতিকে। বলেছেন,

‘যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির যে রকম অদ্ভিষ্টায় না হত তা হলে মেয়েরা বন্দিষ্ট হয়ে জন্মাতো। যদি বল, পুরুষের আত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে যে কোন কাজেই কথা নয়। কেনো না গোড়ায় যদি স্ত্রী পুরুষ সমান বল নিয়ে জন্ম গ্রহন করতো তাহলে পুরুষদের বল স্ত্রীর উপর খাটতো কি করে?’

চলুন, আরও দেখি তিনি কি বলছেন এ প্রসঙ্গে,

‘নানা দিক থেকে দেখা যাচ্ছে মংসারের কন্ড্যান অব্যাহত রেখে স্ত্রীমোক কখনও পুরুষের আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে না। প্রকৃতি এই স্ত্রীমোকের অস্বীনতা কেবল তাদের ধর্মবুদ্ধির উপর রেখে দিয়েছে তা নয়, নানা উপায়ে এমনি আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে মহজে তা থেকে নিষ্কৃতি নেই।’

তিনি পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদের কাজ করার বিরোধিতা করে বলছেন,

‘নারী নারী বন্দিয়াই শ্রেষ্ঠ। তিনি পুরুষের কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে শ্রেষ্ঠতর হইবেন তাহা নহে, বরং বিপরীত ঘটিতে পারে, তাহাতে তাহাদের চরিত্রের কোমলতা, মহিষুতা ও দৃঢ়তার সমাজসম্মত নষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নহে।’

রবীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্ট করে বলছেন যে, প্রকৃতি নারীকে দুর্বল হিসেবে সৃষ্টি করেছে, এক্ষেত্রে পুরুষের যেমন কোন ভূমিকা নেই, তেমনি এর থেকে বের হয়ে আসার কোন পথও নেই, এই দাসত্ব নারীদের জন্মগত, প্রকৃতির বিধান। এধরনের অগুণতি বক্তব্য দিয়েছেন তিনি ১৮৯০-থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে। তাহলে চলুন এখন দেখা যাক তার সমসাময়িক কালের বাকি পৃথিবী কি বলছে, কি করছে তখন, এ প্রসঙ্গে। ঘরের ভিতর থেকেই শুরু করি রমা বাই যে পুরুষের সাথে সমানাধিকার চেয়েছেন তা আমরা আগেই দেখেছি, বিদ্যাসাগর কি বলেছেন তাও দেখলাম, বেগম রোকেয়া ১৯০৪ সালে বলেছেন মেয়েদের এই অবস্থা পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই তৈরি, প্রকৃতি প্রদত্ত নয়। রোকেয়াকে নিয়ে পরে আরেকটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো বলে আপাতত তার প্রসঙ্গ তোলা রইলো। এবার দেখি আন্তর্জাতিক আঙ্গনে কি ঘটেছে এই সময়ে। পুঁজিবাদের বিকাশ হচ্ছে তখন এক অবিশ্বাস্য গতিতে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে নারী স্বাধীনতার এক বিশাল উল্লম্বন ঘটেছে, ছেলেরা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় মেয়েরা দলে দলে বের হয়ে এসে হাল ধরেছে সব কিছুর, প্রমান করেছে নিজেদের যোগ্যতা বাইরের তথাকথিত পুরুষসুলভ কাজে। আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেয়েরা তাদের সমান অধিকার এবং ভোটাধিকারের জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। মেয়েরা ছড়িয়ে পরতে শুরু করছেন বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সব ধরনের চ্যালেঞ্জিং কাজে। আর ওদিকে মার্ক্স, এঙ্গেলস এর সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব তখন দুনিয়া জুড়ে হইচই তুলেছে, ১৯১৭ তে রাশিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে, যেখানে সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা একটা গুরত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এঙ্গেলস বলছেন, পরিবার এবং ব্যক্তিগত মালিকানা

সৃষ্টি হওয়ার ফলশ্রুতিতেই হাজার বছর আগে মেয়েরা হারিয়েছে তাদের আধিকার, কৃষি ব্যবস্থার উদ্ভাবনের অবশ্যাস্তাবি ফলাফল হিসেবে। তাহলে রবীন্দ্রনাথ এসবের কিছুই কি জানতেন না? তাও তো হতে পারে না, যে রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের মত মননের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, মহাবিশ্বের রহস্য, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সুরের মুর্ছনা নিয়ে গভীর আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছেন, আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া সহ পৃথিবীর বহু দেশ চষে বেড়িয়েছেন, বিশ্ব ইতিহাস ঘেটেছেন এবং আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন সেখানে নারী স্বাধীনতার মত এত বড় বিষয়টি তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়। তিনি যে এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তা আসলে তিনি তো তার লেখাতেই বলেছেন, তিনি বলছেন যে চারদিকে নারী অধিকার নিয়ে যে শোরগোল চলছে তাকে তিনি ঠিক মনে করেন না :

‘আজকাল একদম মেয়ে শ্রমাস্ত্রই নাকী সুরে বন্দছে, আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাতে করে কেবল এই হচ্ছে যে, স্ত্রী পুরুষের অধঃস্বপ্ননহীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে; অথচ মে-বন্দন ছেদন করার কোনো ঠপায় নেই। যারা অগত্য অধীনতা স্ত্রীকার করে আছে তারা নিজেকে দাসী মনে করছে; মুত্তরাং তারা আপনার কর্তব্য কাজ প্রমন্ন মনে এবং অম্পূর্নভাবে করতে পারছেননা?’ (রমাবাই এর বস্তুতা ঠপদক্ষে, জৈষ্ঠ ১২২৬)

তাহলে রবীন্দ্রনাথ নারী প্রসঙ্গে যে কথা বলছেন তার ভিত্তিটা কোথায়। কোন দর্শনে বলা হয়েছে যে প্রত্যকটা মানুষ তার নির্দিষ্ট কর্মের সম্পাদনের জন্য এই পৃথিবীতে জন্মায়, তুমি যে কাজের জন্য জন্মেছো সেটাই তোমার ধর্ম, তোমার জাত নির্ধারণ করে দিয়েছে তোমার বিধাতা, সেই অনুযায়ী কর্তব্য পালন করাই তোমার একান্ত ধর্ম? ডঃ হুমায়ুন আজাদসহ অনেকেই রবীন্দ্রনাথের এই নারীমুক্তির বিরুদ্ধের অবস্থানকে ভিকটোরিয়ান ভাবধারা বলে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করলেই দেখা যাবে যে, তিনি যতখানি প্রভাবিত ছিলেন ভিকটোরিয়ান সামন্ততান্ত্রিকতা দিয়ে তার চেয়ে আসলে অনেক বেশি প্রভাবিত ছিলেন সনাতন হিন্দু ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে এবং উপনিষদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে। গীতা বলছে, তোমার জন্ম পূর্ব-নির্ধারিত, তুমি যে জাতে জন্মাবে সে জাতের কাজ করাই হচ্ছে তোমার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের মুখে কি আমরা নারী সম্পর্কে প্রায় একই কথা শুনছি না? প্রকৃতিই তোমাকে তৈরি করেছে দুর্বল করে, দাসী করে, এর বাইরে তুমি বেরবে কি করে, এটাই তোমার ভাগ্য, এটাই তোমার ধর্ম, এই দাসত্বকে খুশি মনে মনে নেওয়াতেই তোমার মংগল। তিনি তার পিতা প্রবর্তিত বাস্তু ধর্মের একজন অত্যন্ত অনুগত ছাত্র ছিলেন, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা এবং ভাববাদ তার ভিতরে আত্যন্ত গভীরভাবে গেড়ে বসেছিল।

তিনি জাপানযাত্রী প্রবন্ধে লিখছেন,

‘এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করে অব চেয়ে চোখে পড়ে জাপানি দাসী,। ... যেনো মানুষের সঙ্গে পুত্রদের সঙ্গে, মাংমের সঙ্গে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ; আর অমন্ত্র শরীরে ক্ষিপ্ততা, নৈপুণ্য, বদ্বিশ্বতা। কিন্তু এটা দেখলেই বোঝা যায় এমন স্নাত্তাবিক আর কিছু নেই। দেহযাত্রার জিনিসটার দ্বার আদি থেকে অশ্রুত দর্শনই মেয়েদের

হাশ্বে, এই দেহযাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবক এবং সুন্দর।
কাজেই এই নিয়ত শ্রমপরশায় মেয়েদের স্বেচ্ছাসেবক যথার্থ মুক্তি পায় বলে শ্রীমান্দ্র করে।

তাহলে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি কি ছিল সেকালের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে? সমগ্র পৃথিবীতে যখন নারী স্বাধীনতা নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে, কয়েক হাজার বছরের গৃহবন্দী নারী যখন বাইরে বের হয়ে আসার সুপক্ষে বাস্তবায়নের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি নারীকে আটকে ফেলার চেষ্টা করছেন বহু শতকের পুরানো সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের খাবার ভিতর। তিনি নারীদের এই সংগ্রামে প্রতি বন্ধুত্বের হাত তো বাড়িয়ে দেনই নি, তাকে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে টুটি চেপে বন্ধ করার পক্ষে কলম ধরেছেন। একে আর যাই বলা যাক নারী স্বাধীনতার সেবক বা নারীবাদ বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। নারীকে একদিকে যেমন যুদ্ধ করতে হচ্ছে তার শ্রেণী অবস্থান থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তাকে আবার যুদ্ধে নামতে হচ্ছে তার শ্রেণীর এবং রবীন্দ্রনাথের মত এলিট শ্রেণীর পুরুষতান্ত্রিক পুরুষদের বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথ তার চারপাশের এলিট বাঙ্গালী নারীদের দেখে লিখলেন সারাদিন গৃহে বন্দী থেকে আর বাচ্চা মানুষ করতে পেরেই বাঙ্গালী মেয়েরা যেন বর্তে গেছে। তাদের আর কোন স্বাধীনতারই দরকার নেই। তাই পাশ্চাত্যের নারীরা যে ঘর থেকে বাইরে পা রাখছে আর কাজ কর্ম করেছে সেটা তার কাছে অমঙ্গলসূচক মনে হয়েছে, মনে করেছেন আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীরা এদের চেয়ে ঢের ভাল আছে। তাই তিনি বলেনঃ

‘আমরা শো দেখতে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাদের মুগোল কোমল দুটি বাহুতে
দু-গাছি বালা পরে মিথের মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে মদা প্রসন্ন মুখে স্নেহ প্রেম
কন্ড্যানে আমাদের গৃহ মধুর করে রেখেছেন। ... যা হোক আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে
আমরা শো বেশ মুখে আছি এবং তারা যে বড় অসুখী আছেন এমনতর আমাদের
কাছে শো কখনও প্রকাশ করেন নি, মাকের থেকে মহস্ব কোড় দুই মোকের অনর্থক হৃদয়
বিদীর্ন হয়ে যায় কেনো?

এখানে কথা হচ্ছিল, আমাদের স্ত্রীমোকেরা মুখী কি অসুখী। আমার মনে হয় আমাদের
মমাজের যে রকম গঠন, শাশে মমাজের ভান মন্দ যাই হোক আমাদের স্ত্রী মোকেরা বেশ
এক রকম মুখে আছে।’ (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ১২২৮)।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চোখে ‘সুখী বাংলার নারী’ মানে হচ্ছে ‘দু-গাছি বালা পরে গৃহ মধুর করে রাখা’
যেমনটি রেখেছিলো তার উঁচু তলার দিদি, বৌদি, জায়া আর কন্যারা। তিনি বোঝেননি যে, বাংলার ৯৫%
এর বেশী নারীই তার এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে না। বাংলার গ্রামের মেয়েরা কেবল দু-গাছি বালা পরে গৃহ
উজ্জ্বল করে রাখেনি বরং অনাদিকাল থেকেই ক্ষেতে খামারে কাজ করেছে পুরুষের পাশাপাশি, ইট ভেঙে-
ছে, ধান ভেনেছে ; তিনি এতো লিখেছেন এতো বিষয় নিয়ে কিন্তু কোথাও কখনও বেগম রোকেয়ার কথা
বলেননি, প্রীতিলতার কথা বলেননি।

রমা বাইয়ের প্রসঙ্গ আগে এসেছে, তিনি নারীদেরকে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে দাবী করেছিলেন, আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তার বিরোধিতা করেছেন। এবার তাহলে দেখা যাক সমসাময়িক কালে বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) কি বলছেন নারীদের অবস্থান এবং নারীমুক্তি নিয়ে, তার সাথে রবীন্দ্রনাথের নারী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোথায়। রোকেয়া ১৯০৪ সালে বলছেন,

‘আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্যই পুরুষগণ এই ধর্মগ্রন্থাদিকে ঠগশুরের আদেশ পত্র বন্দীয়া প্রকাশ করিয়াছেন’, তিনি আরও বলছেন, ‘ধর্ম শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দূর হইতে দূরতর করিয়াছে; ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন।’

তিনি এখানে কোন বিশেষ ধর্মের কথা বলেননি, বলেছেন সব ধর্মের কথাই, তিনি এখানে নারীদের দাসত্বের প্রতিবাদ করেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তির দাবীকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়ে মেয়েদের দাসত্বকে তাদের সনাতন ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পরে লেগেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বেগম রোকেয়ার ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে, সামন্ততান্ত্রিক পুরুষতন্ত্রের পুরোধা এবং রক্ষক হয়ে,

‘অত্র এব আজকাল পুরুষাশ্রমের বিরুদ্ধে যে একটা কোন্দাহম উঠেছে সেটা আমার অমঙ্গল এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনশাস্ত্রহনকে একটা ধর্ম মনে করত; তাতে এই হত যে, চরিত্রের ওপর অধীনতার ক্রুদ্ধ ফলশ্রেণী পারত না, অর্থাৎ ইনশা জন্মাত না, এমনকি অধীনশাস্ত্রেই চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন করত। প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তাহলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না।’ (রেফারেন্স : রমাবাঈ এর বক্তৃতা উপলক্ষে, জৈষ্ঠ ১২৯৬)।

যিনি মেয়েদের নিতান্ত গৃহভৃত্যের সাথে তুলনা করে বলেছেন, ‘প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তাহলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না’ তাকে মনে-প্রাণে এত ‘আধুনিক বা নারীবাদী বা ‘pro-women’ ভাবি কি করে? রোকেয়া যখন আমাদেরকে ধর্মের রূপ উন্মোচন করে দেখাচ্ছেন ধর্ম নারীজাতিকে শৃঙ্খলিত করেছে, তখন রবীন্দ্রনাথ আমাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন হাজার বছরের পুরনো সামন্ততান্ত্রিক আত্যাচারী পুরুষতান্ত্রিক প্রাচীন ভারতীয় দর্শন আর উপনিষদের দিকে। দাসত্বই নারীর ধর্ম তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাউকে নারীবাদী হতে হয় না, হাজার বছর ধরে পুরুষ সমাজ ব্যবস্থা সেই দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পাদন করে এসেছে। রোকেয়া থেকে শুরু করে, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস পর্যন্ত যখন সঠিকভাবেই নারীর এই হাজার বছরের দুর্দশার জন্য পুরুষতান্ত্রিক সামাজ্যব্যবস্থাকে দায়ী করছেন, তখনও দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠিক উলটো সুর তুলেছেন,

‘‘ প্রকৃতিই নারীকে বিশেষ কার্যভার ও তদানুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন – পুরুষের আর্বাভৌমিক স্মার্যদরতা এবং উৎসীড়ন নহে ...’।

রবীন্দ্রনাথ যখন তার হাজার বছরের সামন্ততান্ত্রিক ধারণা থেকে নারীর দুর্বলতাকে প্রকৃতির বিধান বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, তখন রোকেয়া বলছেন,

‘আমরা পুরুষের ন্যায় শিক্ষা অনুশীলনের অম্যক মুবিধা না দাঙুয়ায় দশচাশে দাঙিয়া আছি। অমান মুবিধা দাইনে আমরাঙু কি শ্রেষ্ঠত্ব দাঙু করিশে দারিত্রাম ন? আশৈশব আত্মনিদা ঙুনিশেছি, তাই এখন আমরা অঙ্গুভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্ত্রীকার করি এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি।’ (রোর, ৪৩ - ৪৪)।

সুতরাং একথা বলার অবকাশ আর কোথায় থাকে যে, রবীন্দ্রনাথ তার সময় অনুযায়ী নারীকে দেখেছেন, তিনি তো আসলে সময়ের দাবির চেয়ে অনেকখানি পিছিয়ে ছিলেন এ প্রসংগে। ১৯০০ সালের গোড়ায় এসে নারীরা যখন এই শৃঙ্খল থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য ছটফট করছে, রমা বাই, রোকেয়ারা অসীম সাহস নিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর চেষ্টা করছে, তখন তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াটয়াকে আর যাই বলুন না কেনো প্রগতিশীল নারীবাদী ভূমিকা বলে দাবী করা যায় না। এই দাবীটা শুধু হাস্যকরই নয়, এর মাধ্যমে আসলে নারীজাতির প্রতি, হাজার বছরের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের এই যুদ্ধের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। অনেকে বলছেন রবীন্দ্রনাথ নারী স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন কি ছিলেন না সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে কেনো, একজন সাহিত্যিক হিসেবে কি লিখেছেন বা করেছেন তা নিয়ে আলোচনা হবে, কি করেন নি সেটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করাটা অপ্রয়োজনীয়। আসলে আরেকটি খাঁটি কথা বলছেন তারা। রবীন্দ্রনাথ যদি তখনকার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে কিছুই না বলতেন তাহলে এই যুক্তি হয়তো প্রযোজ্য হতো তার জন্য, কিন্তু যেখানে তিনি এতো সক্রিয়ভাবে তার লেখার মাধ্যমে নারী স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন সেখানে তো তার দায় তাকে নিতেই হবে, তার যথাযোগ্য পর্যালোচনাও হতে হবে। তবে এ কথা কোন মতেই অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে তিনি নারীকে আবার শঙ্কার সাথে ‘কল্যাণীয়া’ হিসেবে দেখেছেন, তাদেরকে তার দেখা অন্তঃপুরের নারীদের মতই শাখা সিঁদুর পরে সুখে রাখার স্পন্দ দেখেছেন, শিক্ষার আলো দিতে চেয়েছেন। তার মন কেঁদেছে তদানিন্তন সমাজের নারীদের দুর্দশা দেখে। কিন্তু যে অর্থনৈতিক মুক্তির মধ্য দিয়ে নারীর এই অবস্থা থেকে মুক্তি ঘটতে পারে তার তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন। নারীর প্রতি তার এই সহানুভূতি এবং ভালোবাসা যেনো এক প্রশয়দাতার করুণা, যা দিয়ে নারীর জীবনের কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়, নারী মুক্তি বা স্বাধীনতার আন্দোলনে এর কোন ভূমিকা নেই। এখানেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাশ্চাত্যের ভিকটোরীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়।

এবার দৃষ্টি ফিরানো যাক নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি তার কি দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো তার প্রতি। অনেকেই খুব নিদারুণভাবে নারী শিক্ষার সাথে নারী মুক্তির ইস্যুটা গুলিয়ে ফেলছেন। আগেই বলেছি, নারী শিক্ষা বিস্তারে কাজ করা আর নারী মুক্তির জন্য কাজ করা দুটো দুই জিনিষ। তিনি নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য কাজ করেছেন, এ ব্যাপারে সে সময়ের ‘স্ট্যুটাস কো’ বজায় রেখেছেন, নারীকে শিক্ষিত করার আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো, তিনি তাকে সমর্থন করেছেন ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ নারীকে দুর্বল এবং পুরুষের অধীন করে রাখা গেছে, এর থেকে বেশী কিছু চাইলেই তিনি তার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলছেন,

‘স্বীমোক্ষের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বনে অবশ্য এ কথা কেউ বদবে না যে, তবে তাদের দেখাদেয়া দেখানো বঙ্গ করে দেওয়া উচিত।’

স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কম, তাদের এই স্বল্প বুদ্ধি নিয়েই তারা যদি উপযুক্ত গৃহলক্ষ্মী হওয়ার জন্য লেখাপড়া করে তাহলে মন্দ হয় না। তিনি আর সবার মতই মেয়েদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন মেয়েদেরকে শিক্ষিত মা, দিদি, গৃহলক্ষ্মী বানানোর জন্য, তাদেরকে পুরুষের সমকক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য নয়, বাইরের জগতে বেড়িয়ে আসার জন্য নয়, নারীর এই শিক্ষা নারীর জন্য নয়, পুরুষের দরকারেই তার প্রয়োজনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বেগম রোকেয়ার মত বলেননি,

‘কম্যা শ্রুতিকে মুশিক্ষিত করিয়া কার্জক্ষেপে ছাড়িয়া দাও, নিজেরা অনবঙ্গ উপার্জন করুক’।

১৮৯১ সালে কৃষ্ণভাবিনী দাস নারী শিক্ষার পক্ষে একটি প্রবন্ধ লিখলে তার সাথে বিতর্ক করার সময় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেন,

‘প্রকৃতিই নারীকে বিশেষ কার্যভার ও শ্রদানুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন - পুরুষের আর্থসামগিক স্মার্থপরতা এবং উৎসীড়ন নহে - অশ্রু এবং বাহিরের কর্ম্য দিমে তিনি মুখীও হইবেন না, অক্ষমও হইবেন না।’

পাঠকেরা, লক্ষ্য করুন কত সারাসরিভাবেই তিনি মেয়েদের অন্তপুর থেকে বের হয়ে আসার বিরোধিতা করেছেন এখানে। অথচ এমন নয় যে, তখনও কোন নারী বাইরে কাজ করতে বের হন নি। নিম্নবিত্ত এবং গ্রামীণ নারীদের কথা না হয় বাদই দিলাম, এমনকি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের কিছু মেয়েও তখন কর্মক্ষেত্রে বেড়িয়ে পড়েছেন। হুমায়ুন আজাদের নারী বইয়ের পরিসংখ্যান আনুযায়ী, দেখা যাচ্ছে, ১৯০১ সালে কোলকাতায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নারীর সংখ্যা ছিলো ৭২৫ জন। ১৮৬৩ সালে ২১ বছরের তরুণী বামাসুন্দরী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন একটি বালিকা বিদ্যালয়, নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও ব্রাহ্ম মনোরমা মজুমদার বরিশালে শিক্ষকতা শুরু করেন, ১৮৬৬ সালে রাধামনি দেবী শেরপুর বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরী শুরু করেন..... তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আগ্রসর তো নয়ই, তিনি যে নারীরা ইতিমধ্যেই সমাজের প্রবল বাঁধা অতিক্রম করে ঘরের বাইরে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন তাদেরকে তো সমর্থন করেনই নি, তাদের বিরুদ্ধেই বরং কলম ধরেছেন। যে রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য খোঁজা হয় ‘বৌয়ের গয়না বেঁচে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা’ করার মধ্যে, তার মধ্যে আর যাই থাকুক নারীমুক্তির কোন আলামত নেই এটা নির্দিষ্ট বলা যায়, মানবতা বলে কোন কিছু থাকলেও হয়তো থাকতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র থেকে এমনকি আজকের গোলাম আজমরাও পর্যন্ত সবাই মেয়েদের শিক্ষার কথা বলে! ইংরেজি কায়দায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছেলেদের জন্য শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করা তখন প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়িয়েছে। শিক্ষিত বৌ বিয়ে করা একটা ফ্যাশন, তাই চাকরী পেয়েই সে পণ করে- ‘যে করিয়াই হৌক এইবার শিক্ষিত মেয়ে বিবাহ করিব।’ মেয়েদের বিশেষত নিজের বৌকে সবার কাছে সুবেশিত ভাবে উপস্থাপন করতে পুরুষ গর্ব বোধ করে। রবীন্দ্রনাথও সেরকম ভাবেই মেয়েদের উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের শিক্ষা চান, তবে সবার জন্য সার্বজনীন শিক্ষা চাননি, কেবল সেই শিক্ষাই চেয়েছিলেন যেটি মেয়েদের পুতুল বানিয়ে রাখবে। তাই তিনি স্ত্রী শিক্ষা প্রবন্ধে পরিষ্কার করেই বলেন :

‘মেয়েদের মানুষ হইতে শিক্ষাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপর মেয়েদের মেয়ে হইতে শিক্ষাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা, তার একটা বিশেষত্ব আছে।’

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই নারীবিরোধী অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পাই তার শেষ বয়সে লেখা নারী প্রবন্ধে। হুমায়ুন আজাদ সে সম্পর্কে সঠিকভাবেই বলেছেন, ‘প্রবন্ধটিতে পাই দুই রবীন্দ্রনাথকেঃ এক রবীন্দ্রনাথ পিতৃতান্ত্রিক, যিনি নারীকে মনে করেন প্রকৃতির অভিপ্রায় বাস্তবায়নের মাংসল যন্ত্র, যার কাজ সন্তান ধারণ পালন, যে বইছে ‘আদি প্রনায়ের সহজ প্রবর্তনা’ নিজের স্নাতকের মধ্যে; আরেক রবীন্দ্রনাথ, অনেকটা বাধ্য হয়ে মেনে নেন যে নারীকে বেড়িয়ে আসতে হবে বাইরে। যে নারী কল্যাণী হয়ে থাকতে চান না, তাদের আমন্ত্রণে তাদের সম্মেলনে এসে রবীন্দ্রনাথ তাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বলবেন, এরকম আরণ্যচক্রের স্নাতক ছিলো না তার। তিনি খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন কর্মমুখর নারীদের সাথে। কৃতজ্ঞ বোধ করছি নিখিলবংগ- মহিলা কর্মীদের প্রতি, কেনোনা তারা নিজেদের সভায় আমন্ত্রণ করে উদ্ধার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তারা রবীন্দ্রনাথে আমন্ত্রণ না জানালে তার তিরোধান ঘটতো নারীমুক্তি বিরোধী পুরুষতন্ত্রের এক বড় পুরোহিত রূপে; আমন্ত্রিত হয়ে রূপান্তরিত হন রবীন্দ্রনাথ, কাটিয়ে ওঠেন নিজের আয়ৌবন প্রগতিবিরোধিতা, স্ত্রীকার করে নেন নারীমুক্তিকে, অনেকটা বাধ্য হয়ে। নারীরাই সৃষ্টি করেন এক নতুন রবীন্দ্রনাথকে, যখন তার বয়স পচাত্তর। যে-নারীমুক্তি একদিন তার কাছে ছিলো অপ্রকৃতস্থ ভুলপ্যাককরা একদল নারীর আস্থালন, তা এখন তার কাছে হয়ে ওঠে অনিবার্যঃ

‘এ দিকে প্রায় পৃথিবীর অক্ষয় দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংস্কারের গন্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এম্মিগ্রেসেণ্ড তার লক্ষণ দেখতে পাই। তার প্রধান কারণ মর্বপ্রই মীমাণা-ভ্রান্তার জুগ এমে পড়েছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্তন অনিবার্জ হয়ে পড়েছে’ (নারী, ৩৭২-৩৮০)।

একটা জিনিষ খেয়াল করুন পাঠকবৃন্দ, রবীন্দ্রনাথ সব সময় তার সময়ের থেকে পিছিয়ে থেকেছেন, রোকেয়া, রমা বাই, এমনকি বিদ্যাসাগররা যে কথা বলেছেন প্রায় অর্ধ শতক আগে আজকে ১৯৩৬ সালে এসে তিনি তিনি তাকে স্ত্রীকার করে নিচ্ছেন, একরকম বাধ্য হয়েই, নারীরা সেই অধিকার কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠা করে ফেলার পর। তাহলে তিনি প্রগতিশীল বা নারীবাদী হলেন কিভাবে?

তিনি এই প্রবন্ধেই মেয়েদের এতো দশকের নারী আন্দোলনকে অস্বীকার করে বলছেন,

‘কামের প্রবাহে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই যে স্ত্রীই প্রমারিত হয়ে চলেছে, এই যে মুক্ত সংস্কারের জগতে মেয়েরা আপনাই চলে এসেছে, এতে করে আশ্রয়ক্ষা এবং আশ্রয় অন্মানের জন্য তাদের বিশেষ করে বুদ্ধি চর্চা, একান্ত আবশ্যিক হয়ে উঠেছে।’

তাহলে কি মেয়েদের এই অধিকার এমনি এমনি চলে আসলো, নাকি পুরুষেরা তাদেরকে উপহার দিলো প্রভু হিসেবে? নারীরা এই অধিকার সত্ত্বই বা আপনা আপনি পান নি, বিশৃঙ্খলে নারীদের আন্দোলন করতে

হয়েছে এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, এমনকি রবীন্দ্রনাথের সামন্ততান্ত্রিক পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হয়েছে তাদেরকে। আমরা সারা বিংশ শতাব্দী ধরেই দেখেছি নারীদের আন্দোলন করে যেতে, যা এখনও আমরা করে চলেছি এই সমাজব্যবস্থায়, তাদের উত্তরসুরী হিসেবে পুরোদমে।

এখন হয়তো অনেকে বলে উঠবেন নারীবাদ না জেনে, রবীন্দ্রনাথের গভীরে না যেয়ে বা ভাসা ভাসা জেনে আমি কোন সাহসে এতো বড় বড় কথা লিখে ফেললাম কেনো। হুমায়ুন আজাদের মত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ এবং নারীবাদী লেখককে যখন কেউ তুড়ি মেরে গ্যলারী লেখক, childish, shallow বলে উড়িয়ে দিতে পারেন তখন আমি তো কোন নসি। তার কোন বই না পড়ে, তার সারা জীবনের গবেষনার কাজ সম্পর্কে কিছুই না জেনে তাকে এভাবে উড়িয়ে দেয়াটাকে কি ধুষ্টতার পর্যায়ে ফেলবো নাকি অজ্ঞতা বলে উড়িয়ে দেবো তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, হুমায়ুন আজাদের সাথে আমরা দ্বিমত পোষন করতে পারি, কিন্তু তার পান্ডিত্যকে তো অস্বীকার করতে পারি না। *নারী* বইটি একটি ঐতিহাসিক দলিল, শুধু বাংলা ভাষায় নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও খুব কম বইই এভাবে সারা বিশ্বের নারীদের অবস্থানকে, তাদের আন্দোলনকে এত সুচারুভাবে দলিলবদ্ধ করতে পেরেছে। বিশ্বায়নের এই যুগে যখন কেউ বলেন মেরী কে বোঝার আগে আমাদের নিজের নারীকে বুঝতে হবে তখন হোচট খাই। নিজের নারীকে বোঝার অর্থটা কি? রবীন্দ্রনাথ যেভাবে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের নারীর পার্থক্য করেছেন তার কি তার কথা বোঝাচ্ছেন, তিনি কি রবীন্দ্রনাথের মত উচ্চ মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত নারীকে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিকতার মোড়কে পুড়ে বিচার করতে বলছেন? নারী মুক্তি আজকে নারীর স্ফূর্তিবুদ্ধি, ছোট ব্রেন কিংবা কোমল হাত, শূন্য বা ভরা কোল, মান আভিমান, অশ্রুজলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, একটি দেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা এবং তাতে একটি মেয়ের শ্রেণী অবস্থান কি তার উপর নির্ভর করবে নারীমুক্তির ভবিষ্যত, রাবীন্দ্রিক উপায়ে নারীকে মিস্টিক সামন্ততান্ত্রিক দাসীর আলোকে বিচার করে মনে হয় না আর কোন লাভ হবে।

কবি ইয়েটস প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ কে অত্যন্ত প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে দেখলেও পরবর্তিতে তার মতামত পরিবর্তন করেন। বার্টান্ড রাসেলের মত আত্যন্ত প্রগতিশীল দার্শনিকও তার দর্শনের তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন :

'I regret I can not agree with Tagore. His talk about the infinite is vague nonsense. The sort of language that is admired by many Indians unfortunately does not, in fact, mean any thing at all.'

হাঙ্গেরিয়ান সাহিত্যিক লুকাস রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে বলেছিলেন :

'Tagore speaks of the "Heavenly Kingdom", "almighty God" and "Soul". If these could remove us from misery what would be the use of man's endeavour to reform the world? We oppose D. Tagore, who tries to stunt the growth of self-determination and the struggle of oppressed classes and races.'

পৃথিবীতে সব বড় এবং মহান ব্যক্তিত্বের সমালোচনা হয়েছে, সব সমাজে, সব দেশে। রবীন্দ্রনাথ তো শুধু একজন কবি বা সংগীতকার বা ঔপন্যাসিক নন, তিনি বাঙ্গালির সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনায় জুড়ে আছেন, তার যথাযোগ্য সমালোচনা হলেই তার সম্পর্কে আমরা সঠিক মূল্যায়নে আসতে পারবো। বুঝতে পারি না, তাকে পুজোর বেদীতে উঠিয়ে রাখার এতো তীব্র প্রচেষ্টা কেনো চারদিকে। রবীন্দ্র সমালোচনাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি হিসেবে ভালো ছিলেন কি খারাপ ছিলেন তার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এখানে কোন বিষয়বস্তু হতে পারেনা, অর্ধ-শতকের বেশী ধরে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে তিনি যে আবদান রেখে গেছেন তাকে এক কথায় ভালো বা খারাপ বলে বিচার করলে তার প্রতি আবিচার করা হয়। বাঙ্গালীদের উপর তার প্রভাব যেমন বিশাল, তেমনি অকল্পনীয় তার ব্যাপ্তি। রবীন্দ্রনাথকে আজকে বিচার করতে হবে তার সাহিত্য দিয়ে, দর্শন দিয়ে, তার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক চিন্তা দিয়ে, নারী, শিক্ষা, ভারতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে - এর সব কিছুকেই আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। তার দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, মূল্যবোধের সমালোচনা মানে এই নয় তার ব্যাপ্তিময় অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। এখানেই বোধ হয় চলে আসে পুজার ব্যাপারটি, যার পূজা বা এবাদত করা হয় তার কোন সমালোচনা করা যাবে না, এভাবেই তো ভাবতে শিখিয়েছে আমাদের চিরন্তন সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্ম, আমাদের আর কি দোষ! প্রথার জগদ্দল পাথর সেই অনাদিকাল থেকেই মাথায় চেপে বসেছে, খুব কম লোকই পারে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে।